দ্য ম্যানহাটন প্রজেক্ট

পারমাণবিক বোমা তৈরির নেপথ্য ইতিহাস

তপেন্দ্রকুমার পাল

পুনশ্চ

॥ ১ ॥

মাদাম কুরি ও রাদারফোর্ডের কাল—পরমাণুর গঠন জানার গোড়ার কাহিনি

উইলহেল্‌ম কনরাড্ রন্টজেন এক্স-রশ্মি আবিষ্কার করার কয়েক মাস পরের ঘটনা। ফরাসি বিজ্ঞানী আন্তোনে হেনরি বেকেরেল তখন গবেষণা করছিলেন আলোর প্রতিপ্রভা (Fluorescence) নিয়ে। কোনো ধাতব মৌলের উপর সূর্যরশ্মি পড়ার পর অন্ধকারে ঐ মৌলটি রাখলে তা থেকে একপ্রকার আলো নির্গত হয়, এটাই প্রতিপ্রভা। তা এ নিয়েই কাজ করেন বেকেরেল। ওঁর পরিবার চারপুরুষ ধরেই পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করে আসছে। হেনরি তাঁর পিতা আলেকজান্দ্রা-এডমন্ড-এর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে একটি ডাবল সল্ট পটাশিয়াম-ইউরেনাইল সালফেট-এর টুকরো পেয়েছিলেন। তাই দিয়েই হেনরি প্রতিপ্রভার গবেষণা করতেন। একদিন কাজের শেষে তিনি এই টুকরোটিকে কাগজে মুড়ে তাঁর গবেষণাগারের ড্রয়ারে রাখেন। নীচে ছিল কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফিক প্লেট। দু-দিন পর সেই প্লেট বার করে তিনি দেখেন তার উপর কুয়াশার মতো কিছু ছোপ পড়েছে। হেনরি ভাবলেন ওই ডাবল সল্টটি অনেকক্ষণ সূর্যের আলোয় রাখা ছিল, তাই বোধহয় প্রতিপ্রভায় প্লেটটি নষ্ট হয়েছে। পরদিন ছিল মেঘলা। সেদিনও একই ঘটনা ঘটায় তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দেয়, বোধহয় সূর্যের আলোর সাথে এই ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। পরে অন্ধকারে বারবার পরীক্ষা করে তিনি নিঃসন্দেহ হন সল্টের মধ্যে থাকা ইউরেনিয়াম-ই এই ঘটনার জন্য দায়ী। বাইরের কোনো প্রভাব ছাড়াই তা থেকে নিরন্তর একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়ে চলেছে। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হেনরি তাঁর এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

ওই একই গবেষণাগারে কাজ করতেন এক ফরাসি দম্পতি। পিয়েরে কুরি ও মাদাম স্ক্লোদোস্কা কুরি। তাঁরা এই অজানা রশ্মির বিষয়ে আগ্রহী হন। সেজন্য খনি থেকে কয়েক টন ইউরেনিয়াম আকরিক 'পিচব্লেন্ড' নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। মাদাম (মেরি) কুরির জন্ম পোল্যান্ডের ওয়ারশ-তে। চব্বিশ বছর বয়সে প্যারিসে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এসে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। তিনিই বিশ্বের একমাত্র মহিলা বিজ্ঞানী যিনি দু'বার নোবেল পুরস্কার পান। প্রথমবার স্বামী পিয়েরে ও হেনরি বেকেরেল-এর সাথে যৌথভাবে ১৯০৩ সালে, পদার্থবিদ্যায়। দ্বিতীয়বার ১৯১১ সালে, রসায়নবিদ্যায়। এবার এককভাবে, রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য। ১৯০৬ সালে মেরিই প্রথম প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা অধ্যাপিকা হিসেবে নিযুক্ত হন।

গবেষণায় কুরি দম্পতি দেখলেন পিচব্লেন্ডে যতটা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম থাকা উচিত এবং তা থেকে যে পরিমাণ রশ্মি নির্গত হওয়া উচিত, বাস্তবে নির্গত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তাঁরা অনুমান করলেন আকরিকে ইউরেনিয়াম ছাড়াও অন্য মৌল আছে যা এই ঘটনার জন্য দায়ী। কঠোর পরিশ্রম করে কুরি দম্পতি ১৮৯৮ সালে পিচব্লেন্ড থেকে প্রথমে পোলোনিয়াম (নিজের মাতৃভূমি পোল্যান্ডের নামানুসারে) সংকেত ($_{84}Po^{209}$), পরে রেডিয়াম ($_{88}Ra^{226}$) আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই নির্গত রশ্মির চরিত্র তাঁরা নির্ণয় করতে পারেননি। পরের বছর ১৮৯৯ সালে রাদারফোর্ড এই রশ্মিকে চিহ্নিত করেন। বলেন, এখানে দু'ধরনের রশ্মি আছে। একটি আলফা (α) রশ্মি, যা আসলে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক। অন্যটি বিটা (β) রশ্মি। ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন কণা। দশ বছর পরে এর মধ্যে আরও একপ্রকার রশ্মির অস্তিত্ব ধরা পড়ল। ১৯০৯ সালে পল ভিলার্ড প্রমাণ করেন এই তৃতীয় রশ্মি কোনো কণা নয়, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। যা গামা (γ) রশ্মি নামে পরিচিত। যে মৌল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই তিনপ্রকার রশ্মি নির্গত হয় মেরি তার নাম দেন তেজস্ক্রিয় মৌল, আর এই রশ্মির নাম দেন তেজস্ক্রিয় রশ্মি।

একদিকে যখন প্যারিসের ফ্রেঞ্চ আকাদেমি অব সায়েন্সে পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্ত-সৃষ্টিকারী আবিষ্কার হচ্ছে তখন ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিও কিন্তু চুপ করে বসে নেই। ১৮৮৪ সালে জে. জে. থমসন কেমব্রিজে 'ক্যাভেন্ডিস অধ্যাপক' হিসাবে যোগ দেন। অত্যন্ত প্রতিভাধর মানুষ। ট্রিনিটি থেকে গণিতের র‍্যাংলার, স্মিথ প্রাইজ ও অ্যাডামস প্রাইজ পেয়ে ততদিনে তিনি বিখ্যাত। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ প্রতিভারা এসে ভিড় জমাচ্ছে ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগারে। পরে এই দায়িত্ব থমসন অর্পণ করেন তাঁরই ছাত্র আর্নেস্ট রাদারফোর্ডকে।

গোল্ডস্টেইন ও ক্রুক্স যাকে ক্যাথোড রশ্মি নামে চিহ্নিত করেছিলেন এই থমসন-ই প্রমাণ করেন তা আসলে ইলেকট্রন কণার স্রোত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নামটাও তাঁরই দেওয়া। পরে তিনি ইলেকট্রনের আধান ও ভরের অনুপাত (e/m) সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। কোনো তড়িৎ নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে যদি ঋনাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় তার মধ্যে সমপরিমাণ ধনাত্মক আধান থাকবেই। ১৮৮৬ সালে ইউজিন গোল্ডস্টেইন ধণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণা (প্রোটন)-র উপস্থিতি অনুমান করলেও সুনির্দিষ্টভাবে এর উপস্থিতি প্রমাণ করেন লর্ড রাদারফোর্ড। তিনি এই কণার নামকরণ করেন 'প্রোটন'।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকেই আধুনিক পরমাণু যুগের শুরু। আজ সেকালের আবিষ্কার নগণ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেকালে কাজটা খুব সহজ ছিল না। সেরা বিজ্ঞানীরাও প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলেন। যেমন পরমাণুর

মধ্যে দুই বিপরীত আধান বিশিষ্ট কণা ইলেকট্রন ও প্রোটন যে আছে তা বোঝা গেল। কিন্তু কীভাবে আছে? বিপরীত আধান হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে পরমাণু সুস্থির ও স্থায়ী। এই জটিল সমস্যার সমাধান ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড তাঁর 'স্ক্যাটারিং' পরীক্ষার সাহায্যে করেন। তিনিই প্রথম বলেন, সমস্ত প্রোটন কণা পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থান করে। আর ইলেকট্রন তার চারিদিকে সৌরমণ্ডলের গ্রহের মতো বৃত্তাকারে পাক খায়। তিনি কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পাননি। ১৯০৮ সালে তিনি নোবেল পেয়েছিলেন আলফা ও বিটা রশ্মির চরিত্র নির্ণয় করার জন্য।

রাদারফোর্ডই আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞানের জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের জন্ম নিউজিল্যান্ডের ব্রাইটওয়াটারে। অদূরে তাসমান সমুদ্র। নিউজিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠ শেষ করে ১৮৯৫ সালে রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে যোগ দেন ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে। গবেষণা শুরু করেন জে. জে. থমসনের অধীনে। পরে কানাডা হয়ে ১৯০৭ সালে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে থমসনের পর তিনিই ক্যাভেন্ডিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই এই গবেষণাগারে বহু উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয়েছে। যার জেরে পদার্থবিজ্ঞান আধুনিক রূপ লাভ করে। তিনি শুধু নিজে বড়োমাপের বিজ্ঞানী ছিলেন না। বহু বিখ্যাত ছাত্র তৈরি হয়েছে তাঁর হাত ধরে। যেমন ভিক্টর অ্যাপলটন, রবার্ট বয়েল, জেমস চ্যাডউইক, প্যাট্রিক ব্ল্যাকেট, নীলস্ বোহ্‌র, জন কক্‌ক্রফ্‌ট্, হানস্ গাইগার, অটো হান, পিয়তর কাপিৎজা প্রমুখ অজস্র নাম। এঁদের মধ্যে সিংহভাগই নোবেল সহ বহু আন্তর্জাতিক মানের পুরস্কারজয়ী। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় তাঁকেই মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭)-র পরে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। একদিকে যেমন ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর খ্যাতি, অন্যদিকে তাঁকে কেন্দ্র করে মজার ঘটনাও কম নয়।

যেমন একটা ঘটনা বলি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে। ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রকে জরুরি সভা ডেকেছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। এই সভায় উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছাড়াও সেনাবাহিনীর উচ্চ আধিকারিকেরা। আলোচ্য বিষয় শত্রুপক্ষের সাবমেরিনের হাত থেকে যুদ্ধজাহাজ রক্ষা করার উপায় নির্ধারণ করা। অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই রাদারফোর্ডও বিজ্ঞানী হিসেবে আমন্ত্রিত। সভা শুরু হবার সময় দেখা গেল একমাত্র অনুপস্থিত ব্যক্তিটির নাম রাদারফোর্ড। মন্ত্রীমশাই তো রীতিমতো ক্ষুব্ধ। এই সভায় না আসা মানে তা দেশদ্রোহিতার শামিল। পরদিনই তাঁর গবেষণাগারে হানা দেয় সরকারি আধিকারিক। এসেই সভায় না যাবার জন্য রাদারফোর্ডের কাছে কৈফিয়ত দাবি করে। তিনি তখন গবেষণায় গভীর মগ্ন। মাথা না তুলে আধিকারিককে নাকি বিরক্তি সহকারে বলেছিলেন, 'আস্তে কথা বলুন মশায়। আমি এখন পরমাণুর অন্তর কৃত্রিমভাবে ভাঙার চেষ্টা করছি। যদি এই কাজে আমি সফল হই তাহলে তা আপনার

যুদ্ধের চেয়ে বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ হবে।' এখনও ক্যাভেন্ডিস ল্যাবরেটরিতে গেলে দেখা যাবে রাদারফোর্ডের সেই ঐতিহাসিক উক্তি, 'টক সফট্‌লি, প্লিজ!'

সেদিন যে গবেষণার জন্য রাদারফোর্ড মন্ত্রীর সভায় যেতে পারেননি তার ফল প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন' -এর, ১৯১৯ সালের জুন সংখ্যায়। ওই একই সময়ে প্যারিসের অদূরে ভার্সাই রাজপ্রাসাদে বসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্তে জার্মানির ভাগ্য নির্ধারণে মশগুল ফ্রান্স সহ অন্যান্য বিজিত দেশগুলি। এখানেই বসে রচিত হয় কুখ্যাত 'ভার্সাই চুক্তি', যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ফিরে যাই আবার রাদারফোর্ডে। সেদিন তিনি যা আবিষ্কার করেছিলেন তা বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনিই প্রথম কৃত্রিমভাবে ট্রান্সমিউটেশন ঘটান। যার অর্থ একটি মৌলকে অন্য মৌলে রূপান্তরিত করা। লোহাকে সোনায় পরিণত করার মতো। তিনি নাইট্রোজেনকে আলফা কণা দ্বারা আঘাত করে সম্পূর্ণ ভিন্ন মৌল অক্সিজেনের আইসোটোপ পান। যেহেতু কালজয়ী আবিষ্কার তাই একটু বুঝে নেওয়া যাক্।

প্রাচীনকালে অ্যালকেমিস্টদের ধারণা ছিল যে একটি মৌলকে অন্য মৌলে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর উপরে ভিত্তি করেই পরশপাথরের কাল্পনিক কাহিনি। এর ছোঁয়ায় লোহা নাকি সোনা হয়ে যায়। সেকালের বহু বিজ্ঞানী তো বটেই এমনকি আইজ্যাক নিউটনও এই অবাস্তব কাহিনি বিশ্বাস করতেন। পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভারী ইউরেনিয়াম, যার সংকেত ${}_{92}U^{238}$। এর অর্থ ইউরেনিয়ামে ৯২টি প্রোটন ও ৯২টি ইলেকট্রন আছে। উপরের সংকেতে ২৩৮ হল ভরসংখ্যা (প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা)। অর্থাৎ নিউট্রনের সংখ্যা ২৩৮–৯২=১৪৬। কোনো মৌলে নিউট্রন সংখ্যার হেরফের হলে মৌলটি প্রায় একই থাকে, তার রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র ভরের পরিবর্তন হয়। এদের আইসোটোপ বলে। কিন্তু প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তন মানেই মৌলের পরিবর্তন। ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন রাদারফোর্ড। অ্যালকেমিস্টদের ধারণা যে একেবারে অবাস্তব নয় তা প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।

রাদারফোর্ডের পরীক্ষার সাংকেতিক রূপ :

${}_{7}N^{14} + {}_{2}He^{4} \rightarrow {}_{8}O^{17} + {}_{1}H^{2} - 1.161\ Mev$; এর অর্থ নাইট্রোজেন আলফা কণার আঘাতে ভেঙে ভিন্নধর্মী অক্সিজেন (${}_{8}O^{16}$)-এর আইসোটোপ ও প্রোটন উৎপন্ন হয়।

রাদারফোর্ডের সৌজন্যে ১৯১৯ সালে কৃত্রিমভাবে প্রথম মৌলের ট্রান্সমিউটেশন সম্ভব হয়। এই সাফল্য এক নতুন যুগের সূচনা করে। কী সেই যুগ তা পরে জানতে পারব। তখনই জানতে পারব এই পরীক্ষার ফল কতটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই পরীক্ষাটি হয়েছিল তা আজও সযত্নে ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগারে রক্ষিত আছে। পর্যটকদের কাছে ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে।

ইতিমধ্যে সাসেক্স-এর বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক সডি ও পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী কাজিমিয়েৰ্জ

ফাজানস্ (Kazimierz Fajans) ১৯১৩ সালে দেখান ইউরেনিয়াম ($_{৯২}U^{২৩৮}$) বা এই জাতীয় ভারী মৌল স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলফা রশ্মি ও বিটা রশ্মি বিকিরণ করতে করতে লেড ($_{৮২}Pb^{২০৬}$) জাতীয় স্থায়ী মৌলে পরিণত হয়। এইভাবে বিকিরণের মাধ্যমে ভারী মৌলের হালকা মৌলে পরিণত হওয়া 'ডিসপ্লেসমেন্ট সূত্র' নামে পরিচিত। রাদারফোর্ডের মতো আঘাত করে ভাঙা নয়, প্রাকৃতিক নিয়মে ভাঙা বলে অনেকে একে ন্যাচারাল ট্রান্সমিউটেশন-ও বলেন। ইউরেনিয়াম ১৮ ধাপ ভাঙার পরে লেডে পরিণত হয়। অ্যাক্টিনিয়াম সিরিজে ইউরেনিয়াম–২৩৫ মৌলটি ১৬ ধাপ ভাঙার পরে পরিণত হবে লেডের আইসোটোপ ($_{৮২}Pb^{২০৭}$)-এ।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর রণনায়কেরা ভাবতে লাগলেন বিজ্ঞানকে কীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। মাঝে মাঝেই বিজ্ঞানীদের ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের সাহায্যে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যেন এককাট্টা। তাঁদের লক্ষ্য একটাই। নতুন নতুন আবিষ্কার ও পরীক্ষাগারে হাতে-কলমে তা প্রমাণ করা। যুদ্ধ সম্পর্কে সবাই যেন উদাসীন। বিজ্ঞানীদের এই উদাসীন মনোভাব সবার যে নজর এড়িয়ে যাচ্ছে তা নয়। অনেকের মত স্পষ্ট, বিজ্ঞানীরা যুদ্ধে সহযোগিতা করতে অনাগ্রহী। অনেকের মতে বিপদ যদি আসে তবে তা আসবে বিজ্ঞানীদের দিক থেকেই। যেমন পোল্যান্ডের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ব্রুনো অ্যালফ্রেড ডবলিন (জন্ম—১০.০৮.১৮৭৮; মৃত্যু—২৬.০৬.১৯৫৭) ১৯১৯ সালের অক্টোবরে ঘোষণা করলেন, 'আগামী দিনে মানবজাতির উপর ভয়ংকর আঘাত আসতে চলেছে। এবং তা আসবে বিজ্ঞানীদের ড্রইং-বোর্ড ও গবেষণাগার থেকেই।' ততদিনে অবশ্য বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে। কিন্তু এটা যে কত বড়ো নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী তা অচিরেই বিশ্ববাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। মাত্র ২৬ বছর পরে বিশ্ব হিরোসিমা নাগাসাকিতে দেখেছে বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল।

ডবলিন ছিলেন স্পষ্টবক্তা। খোলামেলা কথা বলতেন বলে অল্পদিনেই নাৎসিদের রোষানলে পড়েন। তাই প্রাণভয়ে ১৯৩৩ সালে জার্মানি থেকে পালিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে আশ্রয় নেন। ১৯৪০ সালের ১২ মে জার্মানি ফ্রান্সে প্রবেশ করলে ডবলিন আবার পালিয়ে আশ্রয় নেন লস্ অ্যাঞ্জেল্স-এ। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন পশ্চিম জার্মানিতে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজ্ঞানীরা অবশ্য উদাসীন থাকতে পারেননি। ইচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছে যুদ্ধে। এই যুদ্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয়) বহু সম্ভাবনাময় মেধাকে কেড়ে নিয়েছে। যারা বিজ্ঞানকে অনেক সমৃদ্ধ করতে পারত। যেমন এদেরই একজন রাদারফোর্ডের প্রিয় ছাত্র মোজলে। পুরো নাম হেনরি জি. জে. মোজলে (জন্ম—২৩.১১.১৮৮৭; মৃত্যু—১০.০৮.১৯১৫)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই তাঁকে ব্রিটিশ আর্মির টেলিকম্যুনিকেশন অফিসার সে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তুর্কির দার্দানালেস প্রণালীর কাছে